অলস দিনের ভাবনা

অভিজিৎ রায়

ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করে আমি যখন ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ নামের বিজ্ঞানভিত্তিক সিরিজটি ধারাবাহিকভাবে মুক্ত-মনার জন্য লেখা শুরু করলাম, তখন অনেকেই খুব অবাক হয়েছিলেন। কেউ কেউ এটিকে দেখেছিলেন ‘সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন’ হিসেবে। আমার এই সিরিজটি অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে বই আকারে বেরোয়, গত এপ্রিল মাসে। সেই বইয়ের মুখবন্ধে আমি প্রকাশ করেছিলাম কি করে হঠাৎ করেই রবিঠাকুরের গানের লাইনটি আমি শিরোনাম হিসেবে পেয়ে গেলাম:

> ...বইটির নাম ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ হল কেন এ নিয়ে কিছু বলা উচিৎ। সিরিজটি লেখার সময় আমি আসলে ভেবে পাচ্ছিলাম না এমন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক সিরিজের নাম কি হতে পারে। কাব্যিক ধাঁচের নামের প্রতি আমার আকর্ষণ সব সময়ই প্রবল। চিন্তার বেড়াজালে আমি যখন কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, সে সময়েরই এক আলস দুপুরে ঘরে পায়চারী করতে করতে বুক শেলফে রাখা আমার প্রিয় কার্ল স্যাগানের বইটি অবচেতন মনেই হাতে তুলে নিলাম। মলাটে "The Demon-Haunted World' শিরোনামের নীচেই সুন্দর একটা উক্তি - ‘Science As a Candle in the Dark'। চমৎকার! এ ধরনের একটি নামই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। এমনি একটি সুন্দর পংক্তির যুৎসই বাংলা কোথায় খুঁজে পাব, যার মাধ্যমে ধ্বনিত হতে থাকবে আঁধার ঘুচিয়ে আলোকিত পথে যাত্রার ইঙ্গিত? স্যাগানের বইটি বুকের উপরে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলাম মনের অজান্তেই - তন্দ্রার মধ্যে শুনলাম ক্যাসেটে বেজে চলেছে প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গিতটি :
>
> তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?
> ওই যে সুদূর নিহারীকা -
> যারা করে আছে ভিড়,
> আকাশের নীড়
> ওই যারা দিন-রাত্রি
> আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী,
> গ্রহ তারা রবি ...
>
> আর এখানে এসেই আমি থমকে গেলাম। আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’- এই শব্দক’টি মনের গহীনে কোথায় যেন একটি অনুরণন তুলল। ভাবলাম এর চাইতে কাব্যিক আর মনোহর শিরোনাম আর কি হতে পারে? তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আমার প্রথম বইটির শিরোনাম হবে আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’। যে গানটি কবিগুরু দুঃখভারাক্রান্ত মনে কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করে শত বছর আগে লিখেছিলেন, কখনও কি ঘূর্ণাক্ষরেও ভেবেছিলেন, এর একটি পংক্তি ব্যবহৃত হতে পারে বাংলাদেশের এক অখ্যাত লেখকের প্রথম বইয়ের শিরোনাম হিসেবে?...

বইটি প্রকাশ হবার পর বেশ কিছু ভাল পর্যালোচনা হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকায়। প্রথম রিভিউটি আমার নজরে পরে ডঃ শাব্বির আহমেদের, ইংরেজীতে। অসাধারণ রিভিউ। শাব্বিরের লেখার হাত নিয়ে বরাবরই আমার খুব উঁচু ধারণা। প্রত্যেক লেখকেরই পছন্দের নিজস্ব একটা এলাকা থাকে। লিখতে লিখতে সে ওই এলাকাতেই একটা সময় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, পরে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। আমি ভাবতাম শাব্বিরের পছন্দের এলাকাটি হল বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি। এ বিষয়ে তাঁর উঁচুমানের

বেশ কিছু লেখা মুক্ত-মনা, এন.এফ.বি সহ অনেক পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু আমার বইয়ের রিভিউটি পড়বার পর বুঝতে পারি যে, শুধু রাজনীতি নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনেও তার জ্ঞান বেশ গোছানো। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজী দৈনিক আর সাপ্তাহিকগুলো (যেমন, অবজারভার, ইনডিপেন্ডেন্ট, হলিডে ইত্যাদি) যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই শাব্বিরের লেখাটি প্রকাশ করেছে। এন.এফ.বি, বাংলাদেশের ডাক, আর অন্যান্য ইয়াহুগ্রুপগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম।

দ্বিতীয় রিভিউটি আমার নজরে আসে ডঃ হিরন্ময় সেনগুপ্তের। তাঁর পর্যালোচনাটি প্রকাশিত হয় প্রয়াত এস.এম.এস কিবরিয়া সাহেবের গড়ে তোলা 'সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ' পত্রিকায় ৩০ মে, ২০০৫ এ। ডঃ সেনগুপ্ত বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত নিউক্লিয় পদার্থবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন, বিজ্ঞানী হিশেবে তার ব্যাপ্তি দেশের সীমা অতিক্রম করেছে অনেক আগেই। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব আমার মত অখ্যাত লেখকের লেখা বইটি মন দিয়ে পড়েছেন, এটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, প্রশংসা করেছেন- এটি নিঃসন্দেহে আমার জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি।

আমার জানা মতে আমার বইয়ের পরবর্তী রিভিউটি লেখেন ডঃ শহিদুল ইসলাম, দৈনিক সংবাদে। উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক। সমাজনীতি, রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখালিখি করেন। এ নিয়ে তাঁর গোটা পাচেক বই-ও আছে বাজারে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত ডঃ ইসলামের 'বিজ্ঞানের দর্শন' বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মাত্র দু'জন বিজ্ঞানীকে (জে.ডি.বার্নাল এবং জর্জ সার্টন) নিয়ে আলোচনা করে বিজ্ঞানের ক্রম-ইতিহাস যে এত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা যায়, তাই আমার এতোদিন জানা ছিলো না। ইতিহাসবিমুখ সে সমস্ত 'প্রগিতিশীলেরা' যারা ইসলাম ঠেকাতে গিয়ে অন্ধভাবে বুশ-ব্লেয়ারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য বইটি 'অবশ্য পাঠ্য' হিশেবে বিবেচিত হতে পারে। এ বইটি পড়লে তারা জানবেন উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বিজ্ঞানের এবং দর্শনের সমন্বয় করা কতটা জরুরী, আর জানবেন কিভাবে বিজ্ঞান 'মুষ্টিমেয় কতিপয় এলিট শ্রেনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়' একটা সময় শোষক শ্রেনীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে এখনো হচ্ছে। ডঃ ইসলাম অনেক চিন্তা জাগানোর মত উদাহরণ হাজির করেছেন তাঁর বইয়ে। যেমন, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

> 'প্রকৌশল বা প্রযুক্তি থেকে বিজ্ঞানের জন্ম হলেও তার সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা মূল পার্থক্য আছে। তা হলো বিজ্ঞান বরাবরই শিক্ষিত মানুষের কর্মকান্ড। আজও। কিন্তু প্রকৌশল তা নয়। প্রাযুক্তিক বা প্রকৌশলী ঐতিহ্য বংশানুক্রমিকভাবে পরিবাহিত হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মে। কিন্তু বিজ্ঞান তা নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন একটি ব্যাপার যা বই-পত্রের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। তাই শুরু থেকেই বিজ্ঞান একটি এলিট শ্রেনীর বিষয়ে পরিণত হয়। উচ্চশ্রেনীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা শাসকশ্রেনীর সেবাপ্রদানকারী একদল গুনী মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ক্ষুদ্রতা বা সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানের চরিত্রের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে।[১]

আবার কখনও বলেছেন :

> একটা সময় সাধারণ মানুষ দার্শনিকদের শত্রু বলে বিবেচনা করতো। কেননা তাদের সাথে ঘৃণিত রোম সাম্রাজ্যের শোষকশ্রেনীভুক্ত উঁচু শ্রেনীর সখ্যতা কোন রাখ-ঢাকের ব্যাপার ছিলো না। তাই সাধারণ

[১] বিজ্ঞানের দর্শন, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫ পৃঃ ৪৬

> মানুষ কখনও নিরবে, কখনও বা হিংস্রভাবে দার্শনিকদের বিরোধিতা করতো। ... এমনকি শিল্প-বিপ্লবের যুগে মেশিন-ভাঙ্গা দলের কর্মকান্ড প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম ঘটার পরও জনরোষ কিভাবে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলো।[২]

সাধারণ মানুষের সাথে গ্রীক দাশর্নিকদের বিরোধটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ডঃ শহিদুল ইসলাম :

> গ্রিসের তিন প্রধান দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল এথেন্সের সন্তান হলেও সে এথেন্স অবক্ষয়ী এথেন্স। প্রায় আড়াই হাজার বছর এরা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে আসছে। এদের ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। মানব ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন নগরের বৈপ্লবিক মহত্ব থেকে তারা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার প্রচন্ড ক্ষমতা ও সামর্থ লাভ করলেও, সে ক্ষমতাকে তারা প্রতিবিপ্লবের স্বার্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। প্লেটো কর্তৃক চিত্রিত সক্রেটিস, প্লেটো নিজে এবং অ্যারিস্টটল প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের ভয়ে ভীত হয়ে সব সময় গণতন্ত্রের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতেন। পৃথিবী যেন কখনও বদলাতে না পারে-অন্ততঃ গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে প্লেটো অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[৩]

> কেন প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের সাধারণ মানুষ সন্দেহের চোখে দেখতো, তাদের আক্রমণ করতো তা বুঝতে হলে সে সমস্ত বিজ্ঞানীদের শ্রেণী অবস্থান, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, শাসক-শোষিতের সম্পর্কটুকু বুঝতে হবে, শুধু কোরান আর হাদিসের মধ্যে 'ভায়োলেন্ট ভার্সের' সন্ধান করলেই চলবে না। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিও বোঝা চাই। গ্রীক সভ্যতায় সক্রেটিসের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিয়ে হত্যা, কিংবা ইসলামী সভ্যতার যুগে আল কিন্দি, আল রাজি বা ইবনে সিনার উপর অত্যাচার কোনটিই 'ধর্মগ্রন্থ কর্তৃক ভায়োলেন্সের' কারণে ঘটেনি, এগুলোর কারণ পুরোটাই রাজনৈতিক আর সামাজিক। ব্যাপারটা উপেক্ষা করলে চলবে না।

এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে কিন্তু বোঝা যায় যে, ইসলামী সভ্যতার 'আগ্রাসনের' ফলে যে উদ্ভুত পরিস্থিতি তা গ্রীক বা রোমীয় সভ্যতা থেকে কোন অংশেই ব্যতিক্রম নয়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মতই সাধারণ মানুষদের কাছে মুসলিম বিজ্ঞানীরা 'শাসকশ্রেণীভুক্ত' হিশেবে বিবেচিত হতো, তারা ভাবতো ওই সব পন্ডিত উপদেষ্টারা নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আঁটছে। তাই সে সময়ও বিজ্ঞানীরা সহজেই ধর্মান্ধ উন্মত্ততার শিকার হতেন। স্থানীয় রাজবংশের পতন বা অভ্যুত্থানের সাথেও তাঁদের ভাগ্য জড়িত ছিলো। তাই দেখা যায়, সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ইবনে সিনাও কোন সুনিশ্চিত আশ্রয় পাননি। হমদানে বিদ্রোহীরা তার শিরোচ্ছেদের দাবী জানালে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। শেষ মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খলদুনেরও প্রায় একই অবস্থা হয়। কেন প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের সাধারণ মানুষ সন্দেহের চোখে দেখতো, তাদের আক্রমণ করতো তা বুঝতে হলে সে সমস্ত বিজ্ঞানীদের শ্রেণী অবস্থান, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, শাসক-শোষিতের সম্পর্কটুকু বুঝতে হবে, শুধু কোরান আর হাদিসের মধ্যে 'ভায়োলেন্ট ভার্সের' সন্ধান করলেই চলবে না। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিও বোঝা চাই। গ্রীক সভ্যতায় সক্রেটিসের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিয়ে হত্যা, কিংবা ইসলামী সভ্যতার যুগে আল কিন্দি, আল রাজি বা ইবনে সিনার উপর অত্যাচার

[২] বিজ্ঞানের দর্শন, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫ পৃঃ ৪৭
[৩] বিজ্ঞানের দর্শন, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫ পৃঃ ৭৬

কোনটিই 'ধর্মগ্রন্থ কর্তৃক ভায়োলেন্সের' কারণে ঘটেনি, এগুলোর কারণ পুরোটাই রাজনৈতিক আর সামাজিক। খ্রীষ্টধর্মের ভায়োলেন্সগুলোর অনেকগুলোই ধর্মগ্রন্থের কারণে যতটা না ঘটেছে তার চেয়ে বেশি ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক যুগে চার্চের শক্তিমত্তা আর চার্চ কর্তৃক নির্ধারিত এবং আরোপিত ধর্মমতের কারণে। ব্যাপারটা উপেক্ষা করলে চলবে না। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে, ধর্মগ্রন্থের উপর বিশ্বাসের কারণেও 'ভায়োলেন্স' ঘটেছে, প্রবলভাবেই ঘটেছে [৪]। সামাজিক আর রাজনৈতিক কারণের বাইরেও ইসলামী যুগে খাঁটি দর্শন চর্চাকে সন্দেহের চোখে দেখা হত তার একটা বড় কারণ ছিলো দর্শন ও যুক্তির সাথে কোরাণকে মেলানো কঠিন। যেমন, কট্টরপন্থী ইমাম গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১) প্রগতিমনা ও মুক্তবুদ্ধির বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের উপর অতিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রতি রীতিমত জেহাদ ঘোষনা করেছিলেন তার 'দার্শনিকদের বিনাশ' বইয়ে। গাজ্জালীর মৌলবাদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আর ধর্মগ্রন্থ হতেই উদ্ভুত। গাজ্জালীর হাতে পড়েই মূলতঃ মুক্ত-বুদ্ধির চর্চাকারী মুতাজিলাদের একটা সময় সলিল সমাধি ঘটে, যার মুল্য মুসলিম সমাজ আজও পদে পদে দিচ্ছে।

> শক্তি আর ক্ষমতার আস্ফালনে তাদের চোখ এতটাই অন্ধ যে তাদের ভিত্তিপ্রস্তরের গোড়ার ঘুনে ধরা কাঠামো তাদের নজরে পড়ছে না, ভিত্তপ্রস্তরের বাইরের চাকচিক্য দেখেই তারা মোহিত হয়ে আছেন। গ্রীক আর রোমান সভ্যতার ইতিহাস যারা পড়েছেন, তাদের না জানার কথা নয় যে, গ্রীক আর রোমানরাও একটা সময় নিজেদের অজেয়, অক্ষয় আর অবিনশ্বর ভাবতো। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের একদিন পতন হয়েছে। ... আমেরিকা সারা জীবনই 'ক্ষমতার শীর্ষস্থানে' থেকে যাবে এ ধারণায় যারা বিশ্বাস করেন তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ভুলে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর তার তোষণকারী সুবিধাভোগী অংশটিও অচীরেই আস্তাকুড়েই নিক্ষিপ্ত হবেন।

ধর্মগ্রন্থের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৌলবাদীরা সংঘাত সৃষ্টি করছে, বোমা বুকে বেঁধে আত্মাহুতি দিচ্ছে এটা ঠিকই, কিন্তু তাকে সামলাতে গিয়ে বুশ-ব্লেয়ারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন যোগাতে হবে, এর কোন মানে নেই। কিছু 'প্রগতিশীল' লেখক ইসলামী মৌলবাদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে 'বুশ'কে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক স্থানীয় সাহিত্যিক শওকত ওসমান এদের উদ্দেশ্যে বলতেন, এরা 'অভিশপ্ত জীব', আর এদের 'গোলামীর চেতনা সহজে লুপ্ত হয় না।' [৫]। সমস্যা হচ্ছে, একটা জাতি যখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকে তখন তাদের চোখ অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতায় আচ্ছাদিত থাকায় ইতিহাসের ক্রমিক ধারায় তাদের 'অনিবার্য পতন'কে দেখতে পায় না। আমেরিকা আর তাদের অন্ধ-সমর্থকদের হয়েছে সেই দশা। শক্তি আর ক্ষমতার আস্ফালনে তাদের চোখ এতটাই অন্ধ যে তাদের ভিত্তিপ্রস্তরের গোড়ার ঘুনে ধরা কাঠামো তাদের নজরে পড়ছে না, ভিত্তপ্রস্তরের বাইরের চাকচিক্য দেখেই তারা মোহিত হয়ে আছেন। গ্রীক আর রোমান সভ্যতার ইতিহাস যারা পড়েছেন, তাদের না জানার কথা নয় যে, গ্রীক আর রোমানরাও একটা সময় নিজেদের অজেয়, অক্ষয় আর অবিনশ্বর ভাবতো। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের একদিন পতন হয়েছে। গ্রীকদের কথাই ধরি। অভুতপূর্ব বস্তুগত বা জাগতিক সাফল্য আর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সত্ত্বেও গ্রিক রাষ্ট্রগুলো এক অনিবার্য পতনের দিকেই একসময়

[৪] সত্য খোঁজে মুক্ত-মন, সুযোগ খোঁজে সন্ধানী, অভিজিৎ রায়, মুক্ত-মনা

[৫] প্রোফাইল : শওকত ওসমান, বিজ্ঞান চেতনা জানুয়ারী-ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৯৮

অগ্রসর হয়। সে সময় চলছিল 'লৌহযুগের' বিকাশ। লৌহযুগের নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সে সময় যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিলো, এথেন্সের 'গণতন্ত্র' তা থেকে বাঁচবার উপায় খুঁজছিল। গণতন্ত্র ধবংস হয়ে যাবার পর তাকে বাঁচানোর জন্য দুটি পথই খোলা ছিল। এক - দাসপ্রথাকে আরও কঠোর করা আর দুই - বিদেশে আরো বেশী সামরিক অভিযান চালানো। কিন্তু এ দুটোই এথেনীয় গণতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করে তোলে আর তারপর তার পতন ত্বরান্বিত করে। আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে কি আমেরিকার অবস্থা অনেকটা অবক্ষয়ী গ্রীকদের মতই নয়? জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জ ভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু তো ইরাক নয়, বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ঘাটলেও আমেরিকার এই 'যুদ্ধাংদেহী' চেহারাটাই ধরা পড়ে। যারা আমেরিকার 'গণতান্ত্রিক' মূল্যবোধে উদ্বেলিত থাকেন তারা ভুলে যান যে এই গণতান্ত্রিক আমেরিকাই ১৯৫৩ সালে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেককে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরশাসক শাহকে ক্ষমতায় বসায়, ভিয়েতনামে সৈন্য প্রেরণ করে গণহত্যা চালায় [৬], ১৯৭৫-৭৬এ ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে ক্যু করে সরিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায় আর পরবর্তীতে সুহার্তোর নির্বিচারে গনহত্যাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দান করে, প্রায় একই সময় স্বৈরশাসক পলপট যিনি নিজ দেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ মারার জন্য দায়ী- তাকে পর্যন্ত নিজ স্বার্থে সমর্থন করে 'অ্যান্টি-কমিউনিস্ট' আমেরিকা, তারা একটা সময় এলসালভাদর আর আর্জেন্টিনায় স্বৈরশাসকদের সমর্থন করে, নিকারাগুয়ার গণতন্ত্র উৎখাত করে, জিয়াউল হকের মত মৌলবাদী সরকারকে 'মিত্র' হিশেবে সমর্থন করে আর তার ওহাবী ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করে, চিলির স্বৈরশাসক পিনোচেটকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমনের ছয় মাস আগে থেকেই ওসামা-বিন লাদেনকে সাহায্য আর সমর্থন যুগিয়ে প্রকৃত 'লাদেন' হিসেবে গড়ে তোলে এই 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা। ইসলামী মৌলবাদের পীঠস্থান সৌদি-আরব আর তার রাজতন্ত্রকে তো এখনও মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে। সবকিছু না হয় বাদই দিলাম, ১৯৭১ সালে বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী গণহত্যা আর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকার ভুমিকা কি ছিল তা সবাই জানে। বাংলাদেশে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতেরা সুযোগ পেলেই বাংলাভাই-এর অস্তিত্ব নিয়ে 'সন্দেহ' করে, কখনওবা জামাতে-ইসলামীকে 'মডারেট গণতান্ত্রিক' শক্তি মনে করে। তারপরও 'আমেরিকার পলিসির' মধ্যেই 'মুক্তি' খোঁজেন তথাকথিত প্রগতিশীলরা [৭]। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমেরিকার সামরিক আগ্রাসনের কারণে সারা পৃথিবীতেই এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে, আর তার দায়ভাগ বহন করতে হচ্ছে আমেরিকার জনগণকে। সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা, বাড়ছে বেকারত্ব। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিঘাতকে ঠেকাতে জোরদার করতে হচ্ছে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। অপরদিকে আমেরিকার শঙ্কাকে বাড়িয়ে দিয়ে চীনের মত দেশগুলো দ্রুতগামী অশ্বের মতই প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে উঠে আসছে, উঠে আসছে পূর্ব ইউরোপিয়ান দেশগুলো। আমেরিকা সারা জীবনই 'ক্ষমতার শীর্ষস্থানে' থেকে যাবে এ ধারণায় যারা বিশ্বাস করেন তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে

---

[৬] 'উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বর্গমাইল জায়গার উপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্য ৫০০ পাউন্ড বোমা। এমন কি গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিলো দেশের অনেক জায়গায়। ... মাইলাই এর মত বর্বর অত্যাচারও আমেরিকা কমিউনিজম বিরোধী মুক্ত-বিশ্বের আদর্শ দিয়ে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলো'; দেখুন : আদর্শবাদ ও মানুষের সংকট, গোলাম মুর্শিদ, মুক্ত-মনা।

[৭] সাম্রাজ্যবাদ শুধু আমেরিকারই একচেটিয়া নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াও এ ব্যাপারে একটা সময় কম যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরী (১৯৫৬), চেকোসলাভাকিয়া (১৯৬৮) আর আফগানিস্তানে (১৯৭৯) সৈন্য প্রেরণ, চীনের তিব্বতের প্রতি আগ্রাসী নীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারটি শুধু পুঁজিবাদী বিশ্বেরই একচেটিয়া ছিলো না। শ্রেনী শত্রু নিধনের নামে স্ট্যালিন, মাও, পলপটদের নৃশংস অত্যাচার সমাজতন্ত্রের রমরমা সময়ের ওই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভুলে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর তার তোষণকারী সুবিধাভোগী অংশটিও অচীরেই আস্তাকুড়েই নিক্ষিপ্ত হবেন।

প্রতিক্রিয়াশীল (নাকি প্রগতিশীল?) আরেকটি অংশের কথাও বলা প্রয়োজন এপ্রসঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক ঘরণা থেকে উঠে আসা কিছু বাম চিন্তাধারার লোকজন ইদানিং আমেরকিকাকে ঠেকাতে গিয়ে ইসলামী মৌলবাদকে সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা পরোক্ষভাবে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবি ফরহাদ মজহার হচ্ছেন এই গোত্রের। উনি জ্বেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামকে এক করে দেখেন, আর মার্ক্সিয় তত্ত্ব আউরে সেটাকে সময় সময় বৈধতা দিতে চেষ্টা করেন।

প্রতিক্রিয়াশীল (নাকি প্রগতিশীল?) আরেকটি অংশের কথাও বলা প্রয়োজন এপ্রসঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক ঘরণা থেকে উঠে আসা কিছু বাম চিন্তাধারার লোকজন ইদানিং আমেরকিকাকে ঠেকাতে গিয়ে ইসলামী মৌলবাদকে সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা পরোক্ষভাবে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবি ফরহাদ মজহার হচ্ছেন এই গোত্রের। ... সাম্রাজ্যবাদ-তোষণকারীর পাশাপাশি এই বামপন্থিদের আবস্থানটিও জোড়ালো বিশ্লেষণের দাবী রাখে বলে নন্দিনীর মত আমিও আজ মনে করি।

বিন লাদেনের প্রতি মজহার সাহেব একটা সময় এতই গুনমুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি 'চিন্তা' নামক একটা পত্রিকায় 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেনীসংগ্রাম' নামের প্রবন্ধের (ডিসেম্বর, ২০০১) সমাপ্তি টেনেছেন করাচীর 'উম্মত' নামক পত্রিকায় লাদেনের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। চেগুয়েভারা, লেলিন, স্ট্যালিনের মত বিন-লাদেনকেও একই কাতারে ফেলে পুঁজিবাদী শোষনের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী কমরেড' বানিয়ে ছেড়েছিলেন লাদেনকে! 'প্রগতিশীল' এবং 'নিরপেক্ষ' মজহার বিশ্বাস করতেন না ৯/১১ এর বিধ্বংসী ঘটনায় লাদেন জড়িত থাকতে পারে। কারণ তার ধারণা হয়েছিল, 'মুসলমান হিসেবে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার হোসেন ফরহাদ মজহারের এই আপাতঃ 'প্রগতিশীল' মুখোশটি উন্মোচন করেছেন শিল্পীর নিপুনতায়[৮] :

> পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষনের মূল লক্ষ্যবস্তু ধর্ম নির্বিশেষে সারা বিশ্বের শ্রমজীবি নিপীড়িত মানুষেরা নয়, প্রান্তিক ও বিপন্ন ইসলামই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু; এই বিভ্রান্তি থেকে মজহার এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েন যখন অতি সাধারণ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সাধ্যাতিত হয় তাঁর জন্য। কি উত্তর দেবেন তিনি যখন পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নয়, মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যার উন্মত্ততায় মেতে ওঠে? মুসলিম উম্মাহর 'পবিত্র দেশ' পাকিস্তানের মুসলিম শাসকেরা যখন '৭১ এ তাদের ভাষায় বাংলাদেশের নিকৃষ্ট বাঙালী মুসলিম প্রধান জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চালায়? ধর্মের নামে শুধু হত্যা নয়, নারী ধর্ষনকেও জায়েজ করে? সুদানের শক্তিশালী মুসলিম শাসকেরা যখন একই দেশের দারফুরে কালো মুসলিম জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চালায়? ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম কেন্দ্রিয় শাসকেরা যখন একই দেশের আচেহ প্রদেশে স্বাধীকার লড়াইয়ে রত মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিপীড়ন চালায়? যখন সুন্নি গোত্রভুক্ত ইসলামপন্থিরা অপর মুসলিমগোত্র শিয়া বা কুর্দিদের নিশ্চিহ্ন করতে হিটলারের মতো বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে? কি উত্তর তার যখন ইরানের মোল্লাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের মূল শত্রু কমিউনিস্টদের নিধনে মেতে ওঠে ইসলামের নামে? কি বলবেন মজহার যখন আমেরিকা ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদদে লাদেন ও মোল্লা ওমর দেশটিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিয়ে যায়?

[৮] 'জেহাদ ও শ্রেনীসংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে' বাংলাদেশে কী ঘটছে, ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুক্ত-মনা/দৈনিক জনকন্ঠ

> সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, এদের মধ্যে যতই আপাতঃ বিরোধ থাকুক না কেন, তারা উভয়ই মানবতা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এবং একে অপরের পরিপূরক। জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রামকে এক কাতারে ফেলে ধর্ম নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে দাঁড়াবার পরিবর্তে 'বিপন্ন' ইসলামের কথা বলতে গিয়ে সখাত সলিলে নিমজ্জিত ফরহাদের কাছে ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই।

সম্প্রতি গোলাম আযম আর ইনকিলাব যেভাবে ফরহাদ মজহারের প্রশংসা করে চলেছে তাতে বোঝা যায়, তিনি আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন [৯]। 'বিপন্ন ইসলাম'কে তুষ্টকারী তথাকথিত 'বামপন্থি' প্রগতিশীল শুধু ফরহাদ মজহার একা নন, আরো অনেকেই আছেন। সম্প্রতি নন্দিনী হোসেন তার একটি লেখায় এক বাম্পন্থি লেখক ('লেখিকা' শব্দটি আমার পছন্দনীয় নয়) সম্বন্ধে ঠিক তেমনই আভাস দিয়েছেন :

> এবার আপনাকে কিছু কথা বলব ধর্মের ব্যাপারে আমার যা উপলব্ধি তা নিয়ে। আমি ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ নই। যত দূর মনে হয় আপনি ও তা নন। কিন্তু আপনার লিখা পড়ে মাঝে মাঝে আমি সত্যি বিভ্রান্ত বোধ করি। আপনার কথা বার্তা আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে বলে আপনার মনে হয় আমি জানি না, তবে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আপনার কাছে। আচ্ছা আপনিই বলুন এই যে বাংলাদেশে এখন মৌলবাদের এত বাড়-বাড়ন্ত, সমগ্র দেশ ছেয়ে আছে লম্বা আলখাল্লা আর দাঁড়ি- টুপিতে,তা কি আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে ও ছিল? তাই বলে তখন কি দেশের মানুষ মুসলমান ছিল না? তারা নামাজ রোজা ধর্ম কর্ম করত না? আপনারা বামপন্থীরা যদি স্বাধীনতার পর সঠিক ভূমিকা রাখতেন তা হলে কি আজ দেশের এই অবস্থা হতে পারত? আপনারা যদি এই সেদিন ও সাম্রাজ্যবাদের জুজুর ভয়ে সাইদী নিজামীদের সাথে একসাথে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে রাস্তায় না নামতেন তাহলে কি তারা এতটা বাড়তে পারত বলে আপনার মনে হয় ? জামাতে ইসলামী কি এই ধরনের নানা ইস্যুতে পরোক্ষ ভাবে হলে ও আপনাদের নৈতিক সমর্থন পায় নি? আপনারা যতখানি বাক্য হুমায়ুন আজাদ,তসলিমা নাসরীনদের বিষোদগারে ব্যয় করেন,তত খানি কি সাইদীদের বিরুদ্ধে করেছেন কখনও?

মার্ক্সের তত্ত্ব কপচিয়ে 'শোষিত প্রলেতারিয়েত' বিপন্ন ইসলামের পাশে দাড়াতে গিয়ে কিছু বামপন্থিরা নিজেদের অবস্থান ও দর্শনকে এক নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে আনছেন, যেমনি ভাবে একটা সময় অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাববাদকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় প্লেটোবাদ এক নিকৃষ্ট দর্শনে পরিণত হয়েছিলো। আর তার ফলে সাধারণ মানুষের প্রগতিকে ত্বরান্বিত না করে প্লেটোবাদ বরং প্রতিক্রিয়াশীল খ্রীষ্টধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনের যোগান দেয়। রেনেসাঁর প্রারম্ভে প্রথম মানবতাবাদীরা যে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে নি, তার জন্য দায়ী ছিলো প্লেটোবাদ। ঠিক একই কাজ করছেন আজকের কিছু বামপন্থি মার্ক্সিস্টরা। প্রগতিশীল মানবতাবাদী আন্দোলনকে ভূলুন্ঠিত করে তারা বরং প্রতিক্রিয়াশীল জ্বেহাদী কর্মকান্ডকে তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন। সাম্রাজ্যবাদ-তোষণকারীদের পাশাপাশি এই বামপন্থিদের আবস্থানটিও জোড়ালো বিশ্লেষণের দাবী রাখে বলে নন্দিনীর মত আমিও আজ মনে করি।

ডঃ শহিদুল ইসলামের বইটি নিয়ে বলতে গিয়ে রাজনীতিতে ঢুকে পড়তে হল পথ হারিয়ে। আসলে আমার আজকের লেখার শিরোনামটিই হচ্ছে - 'অলস দিনের ভাবনা'। ভাবনাকে তো আর গলায় বেড়ী পরিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, তাই বোধ হয় 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি' বলে আমার মাথা আজ পন করেছে! তবে চিন্তা নেই, পথ হারালেও দেখবেন আবার নানা অলি গলিতে ঢু মেরে শেষে ফিরে আসব

---

[৯] সম্প্রতি জামায়াতের দৈনিক 'নয়া দিগন্ত' পত্রিকায় গোলাম আযম বলেন, 'প্রখ্যাত কলামিস্ট ফরহাদ মজহার দৈনিক যুগান্তরে ৩ সেপ্টেম্বর (২০০৪) একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন'। মজহারের প্রবন্ধে গোলাম আযম এতোই মুগ্ধ যে, মজহারের গোটা লেখাটাই তিনি উদ্ধৃত করেন; দেখুন : 'জেহাদ ও শ্রেনীসংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে' বাংলাদেশে কী ঘটছে, ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুক্ত-মনা/দৈনিক জনকন্ঠ

আমার চিরচেনা 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারে যাত্রী'র রাজ্যে। বলছিলাম আমার বইটার রিভিউ নিয়ে। আমার দৃষ্টিতে আমার বইয়ের সবচাইতে পান্ডিত্যসুলভ পর্যালোচনা বা রিভিউটি লিখেছেন ডঃ বিপ্লব পাল। প্রথমে ইংরেজীতে, পরে এখন আবার এখন সিরিজ আকারে লিখছেন বাংলায়। ইংরেজী রিভিউটি তেত্রিশ পৃষ্ঠার- বর্ণনা, গানিতিক সমীকরণ আর ছবির বিশ্লেষণে ঠাসা। ডঃ অজয় রায়ের মতে, বিপ্লবের রিভিউটি শুধু 'রিভিউ' নয়, নিজেই একটি সয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের উদ্যোগে আমার বইয়ের একটি প্রকাশনা উৎসব হয়ে গেল বাংলাদেশে গত ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অণুষদে। সে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন ডঃ কবীর চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান, বশির-আল হেলাল, মিজানুর রহমান, অরুণ দাসগুপ্ত, এ.এন রাশেদা, ডঃ শহিদুল ইসলামের মত বিজ্ঞজনেরা। তারা আমার বইটি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, সুচিন্তিত মত দিয়েছেন । আমার প্রাপ্তি সত্যই সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এরা ছাড়াও জাহেদ, আবুল কাশেম, অপার্থিব, বিপ্লব, ফতেমোল্লা সহ অনেকেই বিভিন্ন ফোরামে আমার বইটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রসংশাসূচক মন্তব্য করেছেন। কেউ বলেছেন 'স্বপ্ন পূরণ', কেউবা আখ্যায়িত করেছেন 'ফাইনেস্ট বাংলা বুক অন দ্য টপিক', কেউ বা বলেছেন, 'প্রতিটি স্কুল-কলেজে পড়ানো উচিৎ', কেউ বা আবার এমনো মন্তব্য করেছেন - 'এমন তথ্যবহুল, রোমাঞ্চকর আর প্রাঞ্জল লেখা বাংলা সাহিত্যে আগে কেউ লেখেনি!' আমি অনুমান করতে পারি মুক্ত-মনার মাধ্যমে অনেকের সাথেই আমার বন্ধুত্বসুলভ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠায় অনেক বাড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তারা এগুলো বলছেন। আমি এর কোনটারই যোগ্য নই।

আমি ভেবেছিলাম নাটকের এখানেই শেষ। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে নাটকের আসল মজা শুরু হল বইটা বেরুবার মাস খানেক পর থেকে। আমি ভেবেছিলাম আমার বইটির পাঠক থাকবেন ঢাকা শহরের মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেনীর কিছু সদস্য, আর হয়ত আমার কয়েকজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব যাদের ফোন করে করে অনুরোধ করতে হবে - 'দোস্ত আমার বইটা বেরিয়েছে, কিনিস কিন্তু'। তারপর হয়ত কালের আবর্তে আমার বইটা হারিয়েই যাবে। আমার ভুল ভাঙলো যখন বাংলাদেশের দূর-দুরান্ত থেকে আমার অ্যাকাউন্টে ই-মেইল আসা শুরু করল। শিহাব নামের এক ভদ্রলোক সুদূর সিলেট থেকে আমাকে বিশাল এক মেইল করে কৃতজ্ঞতা জানালেন এই বইটি লিখবার জন্যে। সৌরভ নামের এক ডাক্তার ভদ্রলোক নিউইয়র্ক থেকে প্রায় একইরকমভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। একটা সামান্য বই লিখে যে পাঠকদের এতো কাছাকাছি যাওয়া যায় আমার জানা ছিলো না। আমার বইয়ের প্রকাশক মেসবাহউদ্দিন সাহেব ইমেইল করে জানালেন আমার বইয়ের নাকি তিনশ কপি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত। তারা নাকি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়েছেন। আমি তো অবাক। আমি তো চটুল গল্প-উপন্যাস লিখিনি, লিখেছি কাঠ-খোটটা বিজ্ঞানের বই। অঞ্জন দত্ত আর নিমা রহমানের যুগল আবৃত্তি 'প্রিয়বন্ধু'র কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে জয়িতা অর্নবকে খোঁচা মেরে বলছে - 'ন্যাবা- তুই আবার গিটার বাজিয়ে গান গাস, আর লোকে পয়সা খরচ করে তা শোনে?' যাহোক, পরবর্তী বছরের একুশের বইমেলার আগেই হয়তো আমার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে যাবে। এই সংস্করণে পাঠকদের ভাবনা জাগানোর মত আরো কিছু নতুন উপাদান হাজির করবার প্রত্যাশা রাখি।

রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করেছিলাম, আবার তাতেই ফিরে যাই। আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সিরিজটা শেষ হবার পর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' নামে আমি আরেকটা সিরিজ শুরু করেছিলাম। এই শিরোনামটাও রবীন্দ্রনাথের আরেকটা গান থেকে চুরি করা! 'আলো হাতে চলিয়াছে

আঁধারের যাত্রী' মুলতঃ ছিলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। আর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' লেখা হয়েছিলো এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির বস্তুবাদী ধারণাগুলোকে সমন্বিত করে। আমি চাইছিলাম এই সিরিজ দুটি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে, ঠিক যেমন আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' আর 'অনুমান'। সে সময় বহু পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - 'আপনার অনেক প্রবন্ধই দেখছি শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন দিয়ে! কেন বলুন তো?' আবার কেউ আবার একটু খোঁচা মেরে বলতেন - 'আপনি তো দেখছি রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানীই বানিয়ে দিলেন'। আমি হেসে এড়িয়ে যেতাম। আমার মনে হয় এই পরিসরে এর ব্যাখ্যাটাও সেরে ফেলি। কাব্যিক ধাঁচের নামের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে বলে কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গিত আমার প্রিয় সেজন্যে শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের সাথে মানে তার সাহিত্যের সাথে যে বিজ্ঞানের একটা ছোট্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে তা বোধ হয় আমরা অনেকেই জানি না। মাত্র সাড়ে বারো বয়সে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন - 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। এটি কিন্তু এখন স্বীকৃত যে, 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা [১০]। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ দু'জায়গায় সেই কিশোর বয়সে লেখা রচনাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই অনেক বছর পরে শেষ বয়সে এসে কবিগুরু একশো পনের পৃষ্ঠার আরেকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখলেন, নাম - 'বিশ্বপরিচয়'। শুধু তাই নয়, তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার কৃতি শিক্ষক, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসুকে। রবীন্দ্রনাথ তার উৎসর্গপত্রে লিখলেন :

> 'বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

আমি যেমনি ভাবে 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' আর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' - দুটি সিরিজ একে অপরের পরিপূরক হবে বলে ভাবছিলাম, রবীন্দ্রনাথও কি বিশ্বপরিচয় লিখবার আগে ঠিক তেমন করেই ভাবছিলেন? নয়ত তিনি বলবেন কেন -

> 'জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান - কেবলি এই দুই বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করছে' [১১]।

কিংবা আইনস্টাইনের মত একাকিত্বের যন্ত্রণা হয়ত রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন বিজ্ঞানের নান্দনিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে, তাই লিখেছেন :

> মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
> আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।

আইস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় ১৯২৬ সালে, কবিগুরুর দ্বিতীয়বার জার্মানী ভ্রমণের সময়। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের অবশ্য কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটি নিশ্চিত যে, রবিঠাকুরের

---

[১০] রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা, সুশান্ত কুমার মিত্র, অমৃত, ১৬ বর্ষ, ৮ ও ৯ সংখ্যা, ১৩৮৩ বাং

[১১] বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫ খন্ড, পৃঃ ৩৫০

সান্নিধ্য আইনস্টাইনের মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দিয়েছিলো। সেজন্যই আইনস্টাইন পরে চিঠি লিখে কবিগুরুকে জানিয়েছেন [১২] :

> 'জার্মানীতে যদি এমন কিছু থাকে যা কিছু থাকে যা আমি আপনার জন্য করতে পারি, তবে যখন খুশি দয়া করে আমাকে আদেশ করবেন।'

আইনস্টাইনের মত জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে প্রথম সাক্ষাতেই এমন চিঠি পাওয়া চাট্টিখানি ঘটনা নয়। তবে আইস্টাইনের সাথে কবির 'সত্যিকারের' যোগাযোগ হয় এর বছর চারেক পরে - ১৯৩০ সালে। সে সময় আইনস্টাইনের সাথে কবিগুরুর অন্ততঃ চারবার দেখা হয়। ১৪ ই জুলাই তারিখে আইনস্টাইনের সঙ্গে তার কথাবার্তার বিবরণ 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' বইয়ের পরিশিষ্টে ছাপা হয়। জীবনের গভীরতম দর্শন, জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে তারা সেদিন বিস্তারিত আলোচনা করেন। যারা উৎসাহী তারা মুক্ত-মনায় রাখা দিমিত্রি মারিয়ানফের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি (১০ আগাষ্ট ১৯৩০ সালের নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত) দেখে নিতে পারেন :
http://www.mukto-mona.com/Articles/einstein_tagore.htm

১৯৭৭ সালে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত বেলজীয় রসায়নবিদ প্রিগোঝিন এ সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

> 'The question of meaning of reality was the central subject of a fascinating dialog between Einstein and Tagore. Einstein emphasized that the science had to be independent of the existence of any observer. This led him to deny the reality of time as irreversibility, as evolution. On the contrary Tagore maintained that even if absolute truth could exist, it would be inaccessible to the human mind. Curiously enough, the present evolution of science is running in the direction stated by great poet.'

অর্থাৎ, প্রিগোঝিনের মনে হয়েছে, *আধুনিক বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি যে দিকে ঘটছে তাতে আইনস্টাইনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছেন বেশী।* তবে সবাই যে প্রিগোঝিনের সাথে একমত হয়েছেন তা নয়। বিশেষ করে বার্ট্রান্ড রাসেল কবিগুরু সম্বন্ধে কখনই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেন : 'আমি দুঃখিত যে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার একমত হওয়া সম্ভব নয়। অনন্ত (infinite) সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা অস্পষ্ট প্রলাপমাত্র (vauge nonsense)। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সম্বন্ধে তার মন্তব্য ছিলো - 'It was unmitigated rubbish'। [১৩]

প্রিগোঝিনের মনে হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি যে দিকে ঘটছে তাতে আইনস্টাইনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছেন বেশী। তবে সবাই যে প্রিগোঝিনের সাথে একমত হয়েছেন তা নয়। বিশেষ করে বার্ট্রান্ড রাসেল কবিগুরু সম্বন্ধে কখনই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না।

[১২] রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৩১
[১৩] Robindranath Tagore – The Myriad-Minded Man, K. Dutta and A. Robinson, p. 178.

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত কিছু লেখার পর হয়ত কেউ ভেবে নেবেন রবিঠাকুর বুঝি আমার *আইকন*- 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'! না, আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। বরং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অভিযোগ অনেক। তাঁর ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি, দাসত্বসুলভ মনোভাব, সমাজের একটা বড় অংশ মুসলিম সমাজের প্রতি নিস্পৃহতা, নারীস্বাধীনতার প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য, নিজের বাল্যবিবাহ, নিজের মেয়ের বিয়েতে গৌরীদান- এধরণের নানা কাজ আমাকে রবিঠাকুর সম্বন্ধে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। তবে সে গুলো নিয়ে আলোচনার সময় আজ আর হবে না। হয়ত আবার লিখব এ নিয়ে অন্য কোন অলস দুপুরে।

৮.৮.২০০৫